রাখাইনদের ভাগ্যকূল আজকের কুয়াকাটা

ভ্রমণবিলাসী মানুষের পছন্দ কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখা, জেলেদের মাছ ধরা, সমুদ্রের নীল জলরাশি, চর, বনাঞ্চলের দৃশ্যগুলো সাজান আছে এখানে। যা দেখে চোখ জুড়াতে আপনাকে আসতে হবে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই পর্যটনকেন্দ্রে। সমুদ্রের বুকে চর জেগে তৈরি হয়েছে কুয়াকাটা। তাই সাগরকন্যা বলে ডাকা হয় একে। এর অবস্থান পটুয়াখালী জেলায়। এ জেলার কলাপাড়া উপজেলার মহিপুর থানার কুয়াকাটা পৌরসভায় অবস্থিত ১৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের কুয়াকাটা সৈকত। হাসান নীলের প্রতিবেদন।

ধারণা করা হয় এখানে মানুষের আগমন মোঘল বা সুলতানি আমলে। তার আগে এই অঞ্চল ছিল ঘন বনে ভরা। সেই অভয়ারণ্য কেটে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তুলেছিল রাখাইনরা। সে ১৮ শতকের কথা। রাখাইনদের আদি নিবাস ছিল আরকান। কিন্তু বার্মা রাজার কাছে মাতৃভূমি হারাতে হয়েছিল তাদের। বিতাড়িত রাখাইনরা রাজার সৈনিকদের হাত থেকে প্রাণ রক্ষায় তখন ভিটামাটি ছেড়ে নৌকা ভাসায় সাগরে। দল বেঁধে ভাসতে ভাসতে একসময় নৌকা এসে আটকে যায় এক দ্বীপে। দ্বীপটি ছিল পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালী দ্বীপ। নৌকা থেকে তীরে নামে রাখাইনরা। পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানেই নেয় মাথা গোঁজার ঠাই। তবে কিছু রাখাইন বেছে নেয় পাশের ঘন বন। গাছগাছালি কেটে বনের ভেতর বাসযোগ্য করে তোলে। বন বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল খাবারের সহজলভ্যতা।

আজকের এই কুয়াকাটা-ই সেদিনের সেই বন জঙ্গল সাফ করে গড়ে তোলা বসতি। তখন ওই জায়গাটির কোনো নাম ছিল না। এ নিয়ে রাখাইনদের মাথাব্যাথাও ছিল না। পরে রাখাইনরা নিজেদের ভাষায় জায়গাটির নাম রাখে কানশাই। কানশাই শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে ভাগ্যকুল। তবে রাখাইনদের ভাগ্য অতটা ভালো ছিল না। তাদের খাবার পানির বেশ সংকট ছিল। সাগর পাড়ে গড়ে ওঠা সে জনপদে ছিল শুধুই লোনা পানি। সুপেয় পানির জন্য একটি কূপ খনন করে তারা। পরে ওই কূপ থেকে সবাই খাবার মিঠা পানি সংগ্রহ করতে থাকে। রাখাইন সম্প্রদায়ের লোকজন কুয়ার মিঠা পানি শুধুমাত্র পান করতো। বাকি কাজ হতো সাগরের পানিতেই। জনশ্রুতি আছে এই কুয়া শব্দ থেকেই অঞ্চলটির নাম হয় কুয়াকাটা।

এ ইতিহাস অনুযায়ী রাখাইনরাই এ অঞ্চলের ভূমিপুত্র। বিভিন্ন সময় মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা ঠাঁই নিয়েছে কুয়াকাটায়। দিনে দিনে সংখ্যাটি বেড়ে লাখের ঘরে গিয়ে পৌঁছে। তবে মাতৃভূমি ছেড়ে এলেও রাখাইনরা ছেড়ে আসেনি নিজেদের কৃষ্টি কালচার। খাদ্য, পোশাক ও ভাষা সবকিছুতে আজও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। ধর্মীয় সংস্কৃতিও ধরে রেখেছে। বিয়ের অনুষ্ঠানেও রাখাইনরা নিজেদের সংস্কৃতি মেনে চলে। এসব কারণে সেখানে বসবাসকারী বাঙালিদের সঙ্গে সহজেই আলাদা করা যায় তাদের।

দেশে একমাত্র এই স্থান থেকেই সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় দেখা যায়। প্রাকৃতিক নৈসর্গিক দৃশ্য দেখার পাশাপাশি কুয়াকাটা যাওয়ার এটি অন্যতম কারণ। মূল সমুদ্র সৈকতের পরে রয়েছে গঙ্গামতির চর। এই চর পাড়ি দিলেই দেখা মিলবে কাউয়ার চরের। সূর্যোদয়ের পূর্ণাঙ্গ দৃশ্য দেখতে হলে আপনাকে কাউয়ার চরে যেতে হবে। ভোরবেলা এখানে দাঁড়ালেই দেখা যাবে বঙ্গোপসাগরের বুক থেকে ভেসে উঠছে সূর্য। সে বড় মনরোম দৃশ্য। শুরুতে হালকা লাল আলোর রশ্মি ছড়িয়ে যায় ঊর্ধ্বাকাশে। এবার সূর্য উঁকি দেওয়ার পালা। এই দৃশ্যটি দেখতে ততক্ষণে অজস্র দর্শনার্থীর উপস্থিতিতে মুখর সে চর। অপেক্ষা সূর্যোদয়ের। এসময় ক্ষণে-ক্ষণে রঙ বদলাতে থাকে পূবাকাশ। আস্তে আস্তে জল থেকে ভেসে ওঠে সূর্য।

আরও দর্শনীয় স্থান রয়েছে কুয়াকাটায়। সেগুলোর একটি অলিপুরবন্দর। খুব কাছ থেকে মাছ ধরা ও বিক্রি দেখতে চাইলে অলিপুরবন্দরে যেতে ভুলবেন না। খুব একটা সময় লাগবে না। কুয়াকাটা থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বন্দরটি। এখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় জেলেদের হালচাল। তীরে নোঙর করা অসংখ্য নৌকা ট্রলার, জালে ধরা পড়া মাছের ঝাঁক; সবই চোখে পড়বে আপনার। তাজা মাছ খেতে চাইলে এখান থেকে খুব অল্প দামেই কিনতে পারবেন।

কুয়াকাটায় চোখে পড়ে এমন কিছু নিদর্শন যার সাথে মিশে আছে চোখজুড়ান সৌন্দর্য কিংবা ঐতিহ্য। এমনই একটি নিদর্শন নৌকার যাদুঘর। এটি শ্রীমঙ্গল বৌদ্ধবিহার ও রাখাইন মার্কেট সংলগ্ন বেড়ি বাঁধের ঢালে অবস্থিত। প্রাচীনকালে স্থলযানের চেয়ে জলযানের আধিক্য ছিল। এছাড়া কুয়াকাটা ছিল সমুদ্রের কোলে। এ অঞ্চলবাসীরা বড় বড় পাল তোলা নৌকা ও জাহাজ দেখে অভ্যস্ত। একসময় সাগরে এগুলোর অবাধ চলাচল ছিল। আজ অতীত। তবে সেসময়ের কিছু নিদর্শন নিয়ে গড়ে উঠেছে নৌকার যাদুঘর। যেখানে একটি পাল তোলা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ রাখা আছে। জাহাজটি প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর থেকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাখাইন অধুষ্যিত এলাকা হওয়ায় এখানে বৌদ্ধদের আধিক্য দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে বেশ গুরুত্বপুর্ণ। এর একটি মিশ্রিপাড়া বৌদ্ধ মন্দির। কুয়াকাটা জিরো পয়েন্ট থেকে ৭ কিলোমিটার পূর্ব দিকে মিশ্রিপাড়ায় রাখাইন পল্লীতে অবস্থিত। বেশ সম্পদশালী এ মন্দির। এখানে ২০০ বছরের পুরানো এবং উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৌদ্ধ মূর্তি রয়েছে। প্রচলিত আছে এখানে মিশ্রি তালুকদার নামে এক প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন। তার নামেই হয়েছে এখানকার রাখাইন পল্লী ও মন্দিরের নাম। তবে স্থানীয়রা একে সীমা বৌদ্ধ বিহার বলে ডাকে। কুয়াকাটা ইকোপার্কটি জিরো পয়েন্ট থেকে দেড় কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। এটি ৭০০ একর জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বনজ এবং ফলজ গাছ। যা পরিকল্পিতভাবে লাগানো হয়েছে।

সূর্যোদয় দেখার আরও একটি উপযুক্ত স্থান গঙ্গামতির চর। কুয়াকাটার মূল পর্যটন কেন্দ্র থেকে ৬ কিলোমিটার পুবে অবস্থিত এটি। গঙ্গামতির খালে চর জেগে ওঠায় একে গঙ্গামতির চর বলা হয়। সারা কুয়াকাটা জুড়েই রাখাইনদের বাস। তবে সবচেয়ে বড় বসতি গোড়া আমখোলাপাড়া রাখাইন পল্লীতে। এই পল্লী আলীপুর বন্দর থেকে ৩ কিমি পূর্বে অবস্থিত। এখানে টিন ও কাঠ ব্যবহার করে মাচার উপর মন্দিরে ছোট ছোট অনেকগুলো বৌদ্ধ মূর্তি রাখা আছে। এই অঞ্চলে যতটা স্বাদু পানি তার চেয়ে লোনা পানির আধিক্য বেশি। কিন্তু লোনা পানি পান করে তো আর জীবনধারণ করা যায় না। সেজন্য প্রয়োজন সুপেয় পানি। আর এই সুপেয় পানির উদ্দেশ্যে

খোড়া হয়েছিল কুয়া। এই কুয়ায় পানির দুটি উৎস রয়েছে। এক ভূগর্ভস্থ পানি দুই বৃষ্টি বা বর্ষার পানি। কুয়াটি সেখানকার বৌদ্ধবিহারের প্রবেশ মুখে অবস্থিত।

কুয়াকাটা যাবেন আর শ্রীমঙ্গল বৌদ্ধ বিহারে যাবেন না তা কি হয়। কুয়াকাটার কূপের গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে এই দর্শনীয় স্থান। এটি শ্রীমঙ্গল বৌদ্ধ বিহার নামে পরিচিত। এখানে একাধিক বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। এর একটি বৌদ্ধ মূর্তি। ৯টি ধাতুর সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে এটি। বৌদ্ধ বিহারে প্রবেশের মুখে চুনদ্রী দেবীর দুইটি মূর্তি রয়েছে। চুনদ্রী দেবীকে মন্দিরের রক্ষাকর্তা হিসেবে মেনে থাকে রাখাইনরা। এছাড়া উপরের দিকে সিঁড়ির শেষ প্রান্তে রয়েছে শাক্য রাজার মূর্তি। কুয়াকাটার দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে ফাতরার বন একটি। এটি একটি ম্যানগ্রোভ বন। সমুদ্র সৈকতের পশ্চিম দিক থেকে শুরু হয়েছে এ বন। ফাতরা বনকে দ্বিতীয় সুন্দরবন বলা হয়। সুন্দরবনের মতোই উদ্ভিদ, প্রাণিতে ভরপুর ফাতরার বন। এখানে রয়েছে কেওড়া, গেওয়া, সুন্দরী, ফাতরা, গরান, বাইন, গোলপাতা ইত্যাদি ম্যানগ্রোভ প্রজাতির উদ্ভিদ। আর প্রাণির মধ্যে বানর, শূকরসহ অসংখ্য জীবজন্তু ও পাখি রয়েছে। সমুদ্রসৈকত থেকে ইঞ্জিনচালিত বোটে এক ঘণ্টার যাত্রাপথে ফাতরার বনে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কুয়াকাটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আব্দুল আলী গাড়ুলি নামের এক সাপুড়ের গল্প। তার ছিল খুব নামডাক। তার সাপ ধরা নিয়ে নানা লোককাহিনী প্রচলিত আছে। এছাড়াও এখানে রয়েছে চোখ জুড়ানো আরও বেশকিছু জায়গা। এরমধ্যে লেম্বুর বন, শুঁটকি পল্লী, পানির যাদুঘর, লাল কাকড়ার চর, সোনার চর অন্যতম।

ঢাকা থেকে জল ও সড়ক দুই পথেই কুয়াকাটা যাওয়া যায়। সড়কপথে যেতে হলে আপনাকে যেতে হবে সায়েদাবাদ, আরামবাগ বা গাবতলী বাস স্ট্যান্ডে। এখান থেকে শ্যামলী, গ্রিনলাইন, হানিফসহ বেশ কয়েকটি কোম্পানির বাস চলাচল করে। বাসে করে কুয়াকাটা পর্যন্ত ৩০০ কিলোমিটার যেতে ১০/১২ ঘণ্টা সময় লাগবে। বাস আপনাকে সৈকত থেকে ২০০ মিটার দূরে নামিয়ে দেবে। নন এসি, এসি দুই ধরনের বাসই পাওয়া যায়। অন্যদিকে জলপথে যেতে হলে যাবেন সদরঘাট। সেখান থেকে বিকালে বিলাসবহুল লঞ্চ ছাড়ে। পরদিন সকালে আপনি পৌঁছে যাবেন পটুয়াখালী বা কলাপাড়া। সেখান থেকে ভাড়ায়চালিত গাড়ি ধরে পৌঁছাতে হবে কুয়াকাটা। সেখানে ট্রলার, নৌকা ও মোটরচালিত গাড়ি রয়েছে। কুয়াকাটার জল ও স্থলের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখতে পারবেন। রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা আছে কুয়াকাটায়। ডাক বাংলো ও রেস্ট হাউজ রয়েছে। সেখানে রাত্রিযাপনে কর্তৃপক্ষের অনুমতি দরকার। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে হোটেল মোটেল। পছন্দমতো যে কোনোটায় উঠে যেতে পারবেন। তবে দামটা ঠিক করে নেবেন। তবে অন্যান্য জায়গার তুলনায় কুয়াকাটায় থাকার জন্য কম টাকা-ই গুনতে হয়।